Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীজির (সা) বৈবাহিক জীবন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহিমা আক্তার দিনা

রোলঃ 216021255

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীজির (সা) বৈবাহিক জীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহিমা আক্তার দিনা

রোলঃ 216021255

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নবীজির (সা) বৈবাহিক জীবন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাহিমা আক্তার দিনা, আইডিঃ 216021255 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নবীজির (সা) বৈবাহিক জীবন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

ফাহিমা আক্তার দিনা

আইডিঃ 216021255

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

নবীজির (স) বৈবাহিক জীবন থেকে উদাহরণ...6

স্ত্রীদের সাথে নবীজি(স) যেমন ছিলেন...7

খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে নবীজি যেমন ছিলেন 8

আয়িশা রাযি. সাথে নবীজি (সা)যেমন ছিলেন 10

নবীজি (স) সন্তানদের সাথে যেমন ছিলেন...11

সন্তান জন্মের সংবাদে রাসূল (সা.) আনন্দিত হতেন 12

সন্তানদের সাথে আচরণের ব্যাপারে নবীজীর (সা) শিক্ষা 13

বিয়ে দেওয়ার সময় তাঁর মেয়েদের মতামত জিজ্ঞেস করতেন.......................................13

যাদের সাথে তাঁর কন্যাদের বিয়ে দিয়েছিলেন...14

বিয়ের পরও নবীজি সাঃ মেয়েদের যেসব দায়িত্ব পালন করতেন.................................15

বিয়ের পরও তাঁর কন্যাকে যত্ন নিতেন 15

কন্যারা অসুস্থ হলে তাদের সেবা যত্নের ব্যবস্থা করতেন 15

কন্যাদের কেউ তার কাছে আসলে আদর যত্ন করতেন...16

মেয়ে ও জামাই এর মধ্যে ঝামেলা হলে হস্তক্ষেপ করতেন না......................................16

কন্যাদের এমনভাবে বড় করেছেন যেন তারা দুনিয়াতে তুচ্ছ মনে করে 17

দুনিয়া ও আখিয়া কে সর্ব উত্তম হওয়ার ব্যাপারে সন্তানদেরকে শেখাতেন.......................17

কন্যাদের তাহাজ্জুদের নির্দেশ দিতেন 18

সন্তানদের মৃত্যুতে শোকাহত হতেন...18

নাতি-নাতনিদের সাথে নবীজি (সা) যেমন ছিলেন 19

হারাম পরিহার শিক্ষা দিতেন...21

নাতিদের চুম্বন ও কোলে নেওয়া..21
রাসুল (সা.)-এর কাঁধে আরোহণ..21
নাতিদের জন্য দোয়া করতেন..22
আত্মীয়-স্বজনদের সাথে নবীজি (সা) যেমন ছিলেন 23
অতিথিদের সাথে নবীজি (সা) যেমন ছিলেন..26
সর্বজনীন আতিথেয়তা..27
বিদায়কালে উপহার দেওয়া 27
সাহাবিদের সাথে নবীজি (সা) যেমন ছিলেন..28
উপসংহার 30

ভূমিকা

নবীজির(স) বৈবাহিক জীবন আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ছিল মধুর, ভালোবাসাপূর্ণ ও শ্রদ্ধা পূর্ণ.নবীজি (স)তাঁর স্ত্রীদের প্রতি খুবই দয়ালু ও সহনশীল ছিলেন। তাদের সাথে তাঁর আচরণ সর্বকালের সবার জন্য অনুসরণীয়। নবীজি (স) সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে মানবিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে তোলার শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল (স) তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতেন। তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন.তিনি পুরুষদের নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করার উৎসাহ দিতেন।

- স্ত্রীদের সাথে নবীজির (স) আচরণ প্রতিটি স্বামীর জন্য অনুপম আদর্শ। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে আমরা আমাদের ঘর শান্তির নূরে আলোকিত করতে পারি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের আদর্শ হিসেবে নবীজির (স) কে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহ কে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলের অনুসরণের মধ্যে রয়েছে উওম আদর্শ.(আল কুরআন ৩৩ :২১)
নবীজির(স) স্ত্রীদের সাথে আচারণে মহান ছিলেন। *তাঁর জীবনীতে এর প্রচুর প্রমাণ আমরা পাই.অনেক সময় এমন ও দেখা যায় ,অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোনো দম্পতির একসাথে স্বামী স্ত্রী হিসেবে জীবন যাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে.আজ মানুষ যদি নবীজির (স)পথ অনুসরণ করে তাঁর মতো স্ত্রীদের সাথে আচরণ করত,তাহলে অনেক বৈবাহিক সমস্যার ই সমাধান হয়ে যেত। বৈবাহিক বিচ্ছেদের হার দিনে দিনে বাড়ছে। আমাদের উচিত নবীজির (স)* বৈবাহিক জীবন অনুসরণ করা.যার ফলে আমাদের পরিবারে শান্তির নুর প্রবাহিত হবে।

নবীজির (স) বৈবাহিক জীবন থেকে উদাহরণ

নবীজি (স) এগারোজন স্ত্রী ছিলেন -

১। খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ,

২। আয়িশা বিনতে আবু বকর,

৩। হাফসা বিনতে উমার,

৪। সাওদা বিনতে জামআ আল- আমিরিয়্যাহ,

৫। যাইনাব বিনতে জাহশ আল আসাদিয়্যা,

৬। যাইনাব বিনতে খুযায়মা আল- হিলালিয়্যা,

৭। উম্মে সালমা হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া আল মাখযুমিয়্যা,

৮। উম্মে হাবীবা রামলা বিনতে আবু সুফিয়ান আল-আমাউইয়্যা,

৯। মায়মুনা বিনতে আল-হারিস আল-হিলালিয়্যা,

১০। জুওয়াইরিয়্যা বিনতে আল-হারিস আল -মুস্তালিকিয়্যা এবং

১১। সাফিয়্যা বিনতে হুওয়াই আন- নাযিরিয়্যা রাযি.।

নবীজির (স) তাঁর স্ত্রীদের সাথে সুখী জীবন কাটিয়েছেন।নবীজি(স) স্ত্রীদের সাথে ব্যবহারে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।আর কেনই বা তা হবে না! তিনি নিজেই বলেছেন - "তোমাদের মাঝে সর্বোওম সেই ,যে তার স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম। নিশ্চয়ই আমি আমার স্ত্রীদের সাথে ব্যবহারে সর্বোত্তম "।

নবীজি (স) তাঁর স্ত্রীদের প্রতিদিন সময় দিতেন।প্রচুর ব্যস্ততা সত্ত্বেও স্ত্রীদের সাথে গল্প করতেন। ইবাদতের পাশাপাশি স্ত্রীদেরকেও সময় দিতেন। ভ্রমণের সময় স্ত্রীদের সাথে গল্প করতেন। স্ত্রীদের অধিকার রক্ষায় তিনি (স) ছিলেন তৎপর। স্ত্রীদের সাথে উদার আচরণ করতেন। স্ত্রীদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করতেন না ।

স্ত্রীদের সাথে নবীজি(স) যেমন ছিলেন

স্ত্রীদের সাথে কোমল ব্যবহার করতেন । তাদের সময় দিতেন অনেক ব্যস্ততা থাকার পরও । সবার খুঁজখবর নিতেন । এমনকি খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যুর পর ও তিনি তার প্রশংসা করতেন । তার আত্মীয় স্বজনদের খুঁজ খবর নিতেন ।

ইবাদতে সময় দেওয়ার পাশাপাশি স্ত্রীদের সময় দিতেন । আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত , " নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ফজরের দুই রাকাত সুন্নত) সালাত পড়তেন । এরপর আমি জেগে থাকলে আমার সাথে কথা বলতেন । নাহলে জামাআতের সময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন"।

ভ্রমণের সময় স্ত্রীদের সাথে গল্প করতেন । আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত , " নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো যাত্রায় বের হওয়ার আগে স্ত্রীর মাঝে লটারি করতেন । একবার লটারিতে হাফসা আর আমার নাম এল । আমরা দুজনে তাঁর সাথে বের হলাম । নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উটের পিঠে) সারাদিন ভ্রমণে থাকতেন আর রাত হলে আমার সাথে হাঁটতেন আর গল্প করতেন ।"

প্রচুর ব্যাস্ততা সত্ত্বেও স্ত্রীদের সাথে গল্প করতেন । এক রাতে আয়িশা রাযি. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উম্মে জারের গল্প বলছিলেন । একবার এগারো জন নারী একসাথে জড়ো হয়ে কোনো গোপনীয়তা ছাড়া ই নিজ নিজ স্বামীর ব্যাপারে বলবে বলে শপথ নিল । তারপর প্রত্যেকেই তার স্বামী সম্পর্কে বলল । উম্মে জার তার স্বামীর সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়ার পর দেখা গেল , তাদের মধ্যে তার স্বামীই সর্বোত্তম ছিল । আয়িশা রাযি. বলেন , " আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন , ' আমি তোমার কাছে তেমন যেমন আবু জার উম্মে জারের কাছে"।

স্ত্রীদের সাথে উদার আচার আচরণ করতেন । আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত , " নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আ আমার ঘরে ছিলেন এমন একদিন এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা তাঁর কাছে এল । তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন , 'আপনি কে ? জবাব দিল , আমি জাশশামা আল- মুযানিয়্যা ।' তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন , "বরং আপনি তো হুসসানা । কেমন আছেন ? আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা কেমন আছে ? আপনি কী করছেন

এখন ? আপনাকে শেষবার দেখার পর আপনার দিনকাল কেমন কাটেছে ?' সে চলে গেলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম , ' হে আল্লাহর রাসূল , আপনি তার সাথে এত বন্ধুত্বপূর্ণ ও দয়ালু ব্যবহার করলেন কেন ?' নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন ,আয়েশা খাদিজা বেঁচে থাকতে সে আমাদের বাসায় আসতো আর পুরনো বন্ধুদের প্রতি দয়া দয়াদ্র আচরণ করা তো ভালো ঈমানের লক্ষণ।"

খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে নবীজি যেমন ছিলেন

নবীজির (স) স্ত্রীদের কথা বলতে গেলে প্রথমেই খাদিজা (রা) কথা আসে । তিনি নবীজির(স) জীবন দশায় মৃত্যু বরণ করেন।তিনি ছিলেন নবীজির (স)- এর প্রথম স্ত্রী ।সারা পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা চারজন। তারমধ্যে তিনি একজন। কাফেরদের আচরণে নবীজি(স) যে দুঃখ -কষ্ট পেতেন তা একে একে বর্ণনা করতেন হযরত খাদিজা (রা.) কাছে।তিনি সব শুনতেন। নবীজিকে (স) সান্ত্বনা দিতেন। খাদিজা (রা.) কথায় নবীজির (স) দুঃখ-কষ্ট কিছু টা কমতো,লাঘব পেত।নবীজি(স) ও তার প্রতি খুব লক্ষ রাখতেন। এমনকি তাঁর মৃত্যুর পর ও কোনো ছাগল জবাই হলে তাঁর বান্ধবীদের কাছে গোশত পাঠাতেন। খাদিজা(রা.) নাম বলার সময় তাঁর প্রশংসা করতেন।আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত," যখনই আল্লাহর রাসূল(স) খাদিজা(রা.) নাম উল্লেখ করতেন,তার প্রশংসা করতেন। তার প্রশংসা করা এবং আল্লাহর কাছে দুআ করার ব্যাপারে কখনোই তিনি যেন ক্লান্ত হতেন না।"

বর্তমান যুগে মানুষের বৈবাহিক জীবনের অবস্থাগুলো অবাক করার মতো। বর্তমানে প্রায় ই দেখা যায় কোনো ব্যাক্তির প্রথম স্ত্রী মৃত্যুর পর তার ভুলগুলো আলোচনা করে। আবার অনেক সময় দেখা যায়, তালাকের পর স্ত্রীর ভুল গুলো স্বামী বলে বেড়াতে থাকে।আর সেগুলোর ব্যাপারে সে কতটা ধৈর্যশীল ছিল তা বর্ণনা করতে থাকে।

খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার কথা শুনলে খুশি হয়ে উঠতেন

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত,"একবার খাদিজার বোন হালা বিনতে খুওয়াইলিদ আল্লাহর রাসূলের ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তার খলার স্বর খাদিজার কণ্ঠের অনুরুপ ছিল।এতে রাসূলের (স) খাদিজার রাযি. কথা মনে পড়ল। তিনি খুশিতে বলে উঠলেন,'হে আল্লাহ,এটা যেন হালা (খাদিজার বোন) হয়!'আমি ঈর্ষা অনুভব করলাম; বললাম , 'আপনি কুরাইশের সেই বৃদ্ধা মহিলার কথা এখনো বলেন , যার কিনা দাঁত পড়ে গিয়েছিল (বৃদ্ধ বয়সের কারণে) ; অনেক আগেই যে কিনা মারা গিয়েছে আর আল্লাহ আপনার জন্য উওম আরেকজন দিয়ে তাকে প্রতিস্থাপন করেছেন ।' তাঁর মুখের অভিব্যক্তি অন্ধাকারচ্ছন্ন হয়ে উঠল , যা আমি তাঁর মধ্যে কেবলমাত্র আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে দেখতে পেতাম (পূর্ববর্তী জাতিগুলোর প্রতি আজাবের ভয়ে) কিংবা তাঁর উপর যখন ওহি আসত । তিনি (স) বললেন,' আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে উত্তম কাউকে দিয়ে প্রতিস্থাপন করেননি।সে আমার উপর বিশ্বাস করেছিল , যখন লোকেরা আমাকে অবিশ্বাস করত । সে আমাকে তাঁর সম্পদ দিয়ে শক্তি যুগিয়েছিল , যখন লোকেরা আমাকে পরিত্যাগ করেছিল । তার মাধ্যমেই আল্লাহ আমাকে সন্তান দিয়েছেন ।' এ কথা শুনে আয়িশা রাযি. তাঁকে বললেন , ' যিনি আপনাকে সত্য বাণীসহ পাঠিয়েছেন , আমি তাঁর কসম করে বলছি , আজকের পর আমি তার প্রশংসা ছাড়া আর কোনো কথা বলব না ।"আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত , “ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আ আমার ঘরে ছিলেন এমন একদিন এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা তাঁর কাছে এল । তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন , ‘আপনি কে ? জবাব দিল , আমি জাশশামা আল- মুযানিয়্যা ।’ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন , “বরং আপনি তো হুসসানা । কেমন আছেন ? আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা কেমন আছে ? আপনি কী করছেন এখন ? আপনাকে শেষবার দেখার পর আপনার দিনকাল কেমন কাটেছে ?’ সে চলে গেলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম , ‘ হে আল্লাহর রাসূল , আপনি তার সাথে এত বন্ধুত্বপূর্ণ ও দয়ালু ব্যবহার করলেন কেন ?’ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন ,আয়েশা খাদিজা বেঁচে থাকতে সে আমাদের বাসায় আসতো আর পুরনো বন্ধুদের প্রতি দয়া দয়াদ্র আচরণ

করা তো ভালো ঈমানের লক্ষণ।" আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত , " রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজার কথা ঘন ঘন উল্লেখ করতেন । যখনই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ভেড়া কুরবানী করতেন , মাংস কেটে টুকরো করার পর কিছু অংশ তার বান্ধবীদের কাছেও পাঠাতেন।"

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা জীবন দশায় ও তার মৃত্যুর পর অনেক প্রশংসা করতেন ; এমনকি সব স্ত্রীর মধ্যে তারই সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করতেন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক আগ্রহ নিয়ে তার গুণগুলোর কথা বলতেন , হৃদয়ে তার স্থানের কথা জানাতেন। মৃত্যুর পর ও তাঁর হৃদয়ে সিংহাসন জুড়ে ছিলেন খাদিজা রাঃ।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত , " রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীদের ব্যাপারে আমার মনে কখনো ঈর্ষা জাগেনি , কেবল খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছাড়া যেখানে কিনা তাকে আমি কখনো দেখিইনি! যখনই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ভেড়া জবাই করতেন , তিনি সাঃ বলতেন , একটি খাদিজার বান্ধবীদের কাছে পাঠাও।" একদিন আমি তাঁকে বললাম , "আপনার মনে খাদিজার গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি"। এই কথা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশংসা করে বললেন , ' সে তো এমন এমন ধরনের ছিল এবং সে তো আমার সন্তানদের মা।"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই তার প্রশংসা করতে ভুলবেন না এবং ক্লান্ত ও হতেন না। আল্লাহর রাসূল (সা)খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে বলেন , " তার প্রতি ভালোবাসা আল্লাহ নিজেই আমার হৃদয়ে গেথে দিয়েছেন ।"

আয়িশা রাযি. সাথে নবীজি (সা)যেমন ছিলেন

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত , " ঋতুবর্তী অবস্থায় আমি পান করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে দিলে আমি যেখানে মুখ লাগাতাম , তিনি পাত্রে সে জায়গাতেই মুখ লাগিয়ে পান করতেন । আমি কোন হাড় থেকে মাংস খেলে তিনি হারে সেখানেই মুখ লাগিয়ে খেতেন , যেখানে আমি খেয়েছি ।"বাসা থেকে বের হবার সময় স্ত্রীকে চুমো দিতেন আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত , "নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওম রেখে তার স্ত্রীদের

চুমো দিতেন এবং আলিঙ্গন করতে আর তোমাদের মধ্যে প্রবৃত্তির উপর সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ তাঁরই ছিল। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার উরুতে মাথায় রেখে ঘুমাতেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত , "আমরা একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সফরে বের হয়েছিল সেবার আমার গলার হার ভেঙে হারিয়ে গেলাম আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য লোকদের সঙ্গে নিয়ে খুজলেন । সে স্থানে কোন জলাধার ছিল না আবার লোকদের কাছে কোন পানিও ছিল না। আবু বাকর রিযি. এসে আমাকে বকতে লাগতেন । তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছেন। আবু বাকর আমাকে বকতে বকতে পাশ বরাবর ঝাঁকাতে থাকলেন । আমার তখন কিছু করার ছিল না , কারণ , নবীজি আমার উরুর উপর ঘুমিয়ে ছিলেন।"

নবীজি (স) সন্তানদের সাথে যেমন ছিলেন

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের তিনজন ছেলে ও চারজন মেয়ে ছিল। নবীজি (স) তিন ছেলে: কাসিম, আবদুল্লাহ এবং ইব্রাহীম। এই তিনজনই শিশু কালে ইন্তেকাল করেন।

- দুই বছর কয়েক মাস বয়সে কাসিম মক্কায় মারা যান। এ কারণে নবীজিকে (স) আবুল কাসিম বলেও ডাকা হতো। কাসিমের মা ছিলেন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ।
- আব্দুল্লাহর জন্ম ও খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঔরসে হয় । নবীজির (স) নবুয়ত লাভের কিছু কাল পরে তিনি ও ইন্তেকাল করেন।
- ইব্রাহিমের মা ছিলেন মারিয়া আল-কিবতিয়্যা । তিনি ১৭ বা ১৮ মাস বয়সে ইন্তেকাল করেন।

নবীজির (স) চারজন মেয়ে ছিল :

- যায়নাব , রুকাইয়্যা , ফাতিমা এবং উম্মে কুলসুম । তাদের সবার জন্ম খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঔরসে।

তাঁর প্রথম কন্যা যায়নাব এবং তিনি আবুল আস ইবনে আর-রাবিকে বিয়ে করেন ।

রুকাইয়্যা তাঁর দ্বিতীয় কন্যা, উসমান ইবনে আফফানের সাথে তার বিয়ে হয় ।

উম্মে কুলসুম তাঁর তৃতীয় কন্যা ; রুকাইয়্যার মৃত্যুর পর উসমান ইবনে আফফান কে বিয়ে করেন । সবচেয়ে ছোট কন্যা ফাতিমা , তিনি নবীজির (স) সবচেয়ে প্রিয় কন্যা ছিলেন ; নবীজীর (স) এক চল্লিশ বছর বয়সে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । আলী ইবনে তালিবের সাথে তার বিয়ে হয়।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যা দের খুশি করার চেষ্টা করতেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাদের উপহার দিতেন । কাজের ব্যপার দায়িত্বশীল হতে বলতেন।

কন্যাদের সান্তনা দিতেন ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দিতেন ।উসামা ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত , নবীজী সাঃ তার এক মেয়েকে ডেকে পাঠালেন এই বলে যে তার ছেলে মৃত্যু শয্যায়। শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সালাম জানিয়ে বার্তা পাঠালেন , "আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন সবই তাঁর ।তিনি যা কিছু নিয়ে যান , সে সব ও তো তাঁর । সব কিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে । তাই তাকে ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহর কাছে কি আপনার প্রার্থনা করতে বলো।"

আনাস ইবনে মালিক রাযি. বলেন , "আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে সন্তানদের সাথে অধিকতর দয়ালু আর কাউকে দেখিনি ।"

সন্তান জন্মের সংবাদে রাসূল (সা.) আনন্দিত হতেন

হজরত আবু রাফে (রা.) যখন রাসূল (সা.) কে তার পুত্র ইবরাহিমের জন্মের সংবাদ দেন, তখন তিনি খুশি হয়ে তাকে একজন দাস বা সেবক দান করেন।

হজরত ফাতেমা (রা.) ছিলেন নবী করিম (সা.)-এর সবচেয়ে প্রিয় কন্যা। তার ব্যাপারে নবী করিম (সা.) বলতেন, ফাতেমা আমার দেহের একটি অংশ। যাতে তার কষ্ট হয়, তাতে আমারও কষ্ট হয়।' -সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভি রহ., নবীয়ে রহমত, পৃষ্ঠা- ৪২৩

হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) তার সন্তানদের নাম রাখেন। শুধু সন্তান নয় নাতি-নাতনির জন্যও সুন্দর সুন্দর নাম নির্বাচন করেন তিনি। হজরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, হাসান জন্মগ্রহণ করলে আমি তার নাম রাখি 'হারব'। অতপর রাসূল (সা.) আসলেন এবং বললেন, আমাকে আমার নাতি দেখাও। তোমরা তার কী নাম রেখেছো?

হজরত আলি (রা.) বলেন, আমি বললাম, হারব। ' রাসূল (সা.) বললেন, না। তার নাম হাসান। ' -মুসনাদে আহমদ : ৭৬৯।

সন্তানদের সাথে আচরণের ব্যাপারে নবীজীর (সা) শিক্ষা

নবিজি সাঃ বলেন , কাউকে যদি মেয়ে সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং সে যদি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার , করে তবে তারা জাহান্নাম থেকে তার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে ।

জাহেলি যুগে দেখা যেত মেয়েদের বোঝা মনে করা হতো জন্মের পর তাদের মাটিতে পুঁতে দেয়া হতো।

আল্লাহ দেখবেন- সে মেয়েদের সাথে ভালো ব্যবহার করে কিনা যদি তাতে সে সফল হয় তবে জাহান্নাম থেকে সে দূরে থাকবে । এর কারণ হলো প্রকৃতজ্ঞতা ভাবে মেয়েরা দুর্বল হয়ে থাকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

নবীজি সাঃ তার মেয়েদের অনেক ভালোবাসতেন তিনি তাদের ব্যাপারে অনেক খুঁজেছিলাম এবং আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই তাদের যথার্থ বেড়ে ওঠার ব্যাপারে তিনি খেয়াল রাখতেন।

বিয়ে দেওয়ার সময় তাঁর মেয়েদের মতামত জিজ্ঞেস করতেন

বর্তমান যুগে বা জাহেলিয়াত যুগে দেখা যেত মেয়েদের মতামত নেওয়া হতো না তাদের জিজ্ঞেস করা হতো না অনেক সময় তাদের অমতে বিয়ে দেওয়া হতো। কন্যা সন্তান পিতার কাছে একধরনের আমানত। তার অসম্মতিতে বিয়ে দেওয়া সে আমানতের খেয়ানত এবং এটা নিষিদ্ধ।

আতা ইবনে রাবাহ রাহ. থেকে বর্ণিত , যখন আলী রাযি. ফাতিমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন , তখন তিনি

(সা) ফাতিমাকে বললেন , " আমি তোমার কথা বলেছে ।"ফাতিমা নিরব থাকলেন (সম্মতি দিলেন)।এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে আলীর বিয়ে দিলেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, " কুমারী মেয়ে তার সম্মতি না দিলে তাকে বিয়ে দেওয়া উচিত নয়।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো , " কীভাবে সে সম্মতি দিবে"? তিনি (স) উওর দিলেন , " তার নীরবতাই তার সম্মতি "।

যাদের সাথে তাঁর কন্যাদের বিয়ে দিয়েছিলেন

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যারে সর্বোত্তম মানুষদের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন।

- নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ গোত্রের আবুল আস ইবনে আর রাবির সাথে তার বিয়ে দেন । আবুল আস তাঁর খালা হালা বিনত খুওয়াইলিদের ছেলে ছিলেন এবং তিনি মক্কায় সম্পদ , ব্যবসা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন।
- নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকাইয়্যার সাথে উসমান ইবনে আফফানের রাযি. বিয়ে দেন । তাকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রদ্ধা করতেন এবং অনেক ভালবাসতেন । তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জান্নাতের সুসংবাদও দিয়েছিলেন । এমন কি রুকাইয়্যার মৃত্যুর পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আরেক মেয়ে উম্মে কুলসুমের সাথে ওসমানের বিয়ে দেন তিনিও উসমানের জীবন দশায় ইন্তেকাল করেন । তার অন্যতম গুণ ছিল লজ্জাশীলতা ।
- নবীজি সাঃ ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহাকে আলী ইবনে আবু তালিব রাযিআল্লাহু আনহুর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন । ছোটবেলা থেকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজির সাঃ এর বাড়িতে বড় হয়েছেন । নবুয়ত লাভের সময় তিনি তার বাড়িতে ছিলেন এবং নবুওয়াত লাভের পরও তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন । আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তরুণদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন । নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনেক পছন্দ করতেন । ইসলামের খিদমতের কারণে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

বিয়ের পরও নবীজি সাঃ মেয়েদের যেসব দায়িত্ব পালন করতেন

নবীজি সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের পর মেয়ের নতুন বাসস্থানের জন্য উপহার পাঠাতেন । আরি রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত , যখন নবীজি সাঃ ফাতিমাকে তার সাথে বিয়ে দিলেন , তখন তিনি তার সঙ্গে একটি জামা , খেজুর ছোবড়া ভরা চামড়ার একটি বালিশ , দুটো যাতা এবং দুটো পাত্র দিয়েছিলেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে পেছনে উত্তর দিকে একটি ছোট ঘর উপহার দিয়েছিলেন। নবিজি সা মেয়েদের জন্য বিয়ের ভোজের আয়োজন করতেন । বুরাইদা থেকে বর্ণিত , আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কাকিমার রাযিআল্লাহু আনহাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন , তখন তিনি সাঃ বললেন , “ অবশ্যই ভোজের আয়োজন থাকতে হবে”। তখন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন যে তিনি একটা ভেড়া আনবেন ; অন্য আরেক সাহাবী বললেন তিনি অমুক পরিমাণ গম আনবেন ।

নবীজি সাঃ বিয়ের পরপরই ভুজের এর আয়োজন করা।

বিয়ের পরও তাঁর কন্যাকে যত্ন নিতেন

নবীজি সাঃ বিয়ের পরও তাঁর কন্যাদের যত্ন নিতেন। খোঁজখবর নিতেন । কঠিন সময়েও তিনি তাদের খোঁজখবর নিতে ভুলতেন না । বদর যুদ্ধের সময় তাঁর মেয়ে রুকাইয়্যা অসুস্থ হয়ে পড়লে উসমান রাযি. তার সেবার জন্য মদিনায় রেখে গেলেন । শুধু তাই নয় যুদ্ধের গনিমতের একটি অংশ তাকে দিলেন এবং অন্যদের সমপরিমাণ যুদ্ধের সাওয়াব তিনি পাবেন বলে আশ্বস্ত করলেন।

কন্যারা অসুস্থ হলে তাদের সেবা যত্নের ব্যবস্থা করতেন

বদর যুদ্ধের সময় নবীজি সাঃ এর মেয়ে রুকাইয়া অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নবীজি সাঃ ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহা কে তার মেয়ে রুকাইয়া সেবার জন্য মদিনায় রেখে গেলেন শুধু তাই নয় যুদ্ধের একটি গনিমতের অংশ তাকে দিলেন এবং অন্যদের সমপরিমাণ যুদ্ধের সাওয়াব ও তিনিই পাবেন বলে আশ্বস্ত করেন।

এভাবেই নবীজি সাঃ কন্যাদের খোঁজ খবর রাখতেন।

কন্যাদের কেউ তার কাছে আসলে আদর যত্ন করতেন

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন , "যখন ফাতিমা নবীজির সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাসায় বেড়াতে আসতেন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়িয়ে তাকে চুমু দিতেন এবং তাঃর জায়গায় বসতে দিতেন আর যখন নবীজি সাঃ এনাকে দেখতে যেতে ফাতেমা উঠে দাড়িয়ে তাকে চুমু দিতেন এবং তার জায়গায় তাঁকে বসতে দিতেন।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত , মিনা রাদিয়াল্লাহু আনহা একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত করে হেঁটে আসছিল । তাকে দেখে নবীজি সাঃ বললেন , " স্বাগতম , আমার মেয়ে"! তারপর তিনি তাকে তার ডানে বসতে দিলেন।"

মেয়ে ও জামাই এর মধ্যে ঝামেলা হলে হস্তক্ষেপ করতেন না

একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা রাযিআল্লাহু আনহার বাড়িতে গেলেন এবং তিনি সেখানে আলীকে খুঁজে পেলেন না । তখন তিনি ফাতেমাকে জিজ্ঞেস করলেন , "তোমার চাচাতো ভাই কোথায়?" তিনি উত্তর দিলেন , "আমাদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল তাই দুপুরে না ঘুমিয়ে তিনি রেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন ।'ওয়ালাইকুম আসসালাম এক লোককে খুঁজতে বললেন । লোকটি এসে জানালো , আলী রাদিয়াল্লাহু আনহা মসজিদে ঘুমাচ্ছেন । তোমার কাছে গেলেন এবং তার জামার কিছু ধুলা তার উপর পড়ল। তখন তিনি এগুলো ঝেড়ে দিতে দিতে তাকে বললেন , উঠ আবু তুরাব!"

এখানে আমাদের কাছে শিক্ষনীয় অনেক আছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাদের কথা কথা না জিজ্ঞেস করে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহা কে খুশি করার চেষ্টা করছেন এবং তাকে ছদ্ম নামে ডাকছে । বর্তমানে এর বিপরীত চিত্র দেখা যায় বাবা মারা সন্তানদের আরও উসকে দেন। সমস্যা কমানোর বদলে বাড়িয়ে দেন ।

কন্যাদের এমনভাবে বড় করেছেন যেন তারা দুনিয়াতে তুচ্ছ মনে করে

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত , একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাকিমার ঘরে গেলেন কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করলেন না। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘরে এলে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে কথা জানালেন তিনি নবীজির কাছে গিয়ে এই সম্পর্কে জানতে চাইলেন ।তখন তিনি বললেন ,'আমি তার দরজায় নকশা করা পর্দা ঝুলতে দেখেছি। দুনিয়ার চাকচিক্যের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য যা পছন্দ করতেন না তার কন্যাদের ব্যাপারেও তা পছন্দ করতেন না ।

দুনিয়া ও আখিয়া কে সর্ব উত্তম হওয়ার ব্যাপারে সন্তানদেরকে শেখাতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত , একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাকিমার ঘরে গেলেন কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করলেন না। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘরে এলে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে কথা জানালেন তিনি নবীজির কাছে গিয়ে এই সম্পর্কে জানতে চাইলেন ।তখন তিনি বললেন ,'আমি তার দরজায় নকশা করা পর্দা ঝুলতে দেখেছি। দুনিয়ার চাকচিক্যের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য যা পছন্দ করতেন না তার কন্যাদের ব্যাপারেও তা পছন্দ করতেন না ।

নবীজি চাইতেন না তারা দুনিয়ায় বিমুখ থাকোক । তিনি চাইতেন তারা যেন দুনিয়া বিমুখ হয়। পুরনোদিনী তাদের জন্য এ জীবনে পরিষ্কার হলে তখন সেটার জন্য কোন পুরস্কার থাকবে না।

আলী রাযি. থেকে বর্ণিত , " ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা চাকা চালানো কষ্ট সম্পর্কে একবার অভিযোগ প্রকাশ করলেন । এসময় নবীজি সাঃ হাতে কিছু যুদ্ধবন্দী এলো। ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে

গেলেন কিন্তু তাকে না পেয়ে আইশা রাযি. কাছে তার চাহিদার কথা বলে গেলেন ।নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে এলেন তখন ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার আশা ও তার চাওয়ার ব্যাপারে আইশা রাদি আল্লাহু আনহা তাকে জানালেন। নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ঘরে এলেন । আমরা তখন বিছানায় শুয়ে ছিলাম তাকে দেখে আমি উঠে বসতে চাইলাম কিন্তু তিনি বললেন, 'তোমরা যেভাবে ছিলে সেভাবেই থাকো'। এরপর তিনি আমাদের মাঝে এমনভাবে বসে পড়লেন যে আমি তার দুই পায়ের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম । তিনি বললেন , 'তোমরা যা চেয়েছিলে আমি কি তার চেয়ে উত্তম জিনিস শিক্ষা দিব না?' তোমরা যখন ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় যাবে তখন ৩৪ বার আল্লাহু আকবার , ৩৩ বার সুবাহানাল্লাহ , ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ পড়ে নিবে অপেক্ষা অনেক উত্তম।"

নবীজী সাঃ চাইলেই তাদের দিতে পারতেন কিন্তু তিনি তাদের খাদেম দেননি এ কারণে যে তার কাছে যাই আস তো তাই তিনি দান করে দিতেন । তার সন্তানদের ব্যাপারেও তিনি অনুরোধ চাইতে যেন তারাও দান করে আখেরাতে পুরস্কার লাভ করে।কত যত্ন সহকারে তিনি তাঁর মেয়ে ও মেয়ে জামাইকে বুঝাতেন ।

কন্যাদের তাহাজ্জুদের নির্দেশ দিতেন

আলী ইবনে তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত, একরাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা ও তার কাছে এলেন । তিনি (সা) তাদের জিজ্ঞেস করলেন , " তোমরা তাহাজ্জুদ পড়ো না"? আলী বলেন , আল্লাহর রাসূল , আমাদের রুহ আল্লাহর হাতে , তিনি যখন ইচ্ছা করেন , তখন আমরা জেগে উঠি'।

সন্তানদের মৃত্যুতে শোকাহত হতেন

ফাতিমা রাযি. ছাড়া নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব সন্তান তার জীবন দশায় ইন্তেকাল করেন । ফাতিমা রাযি. তাঁর মৃত্যুর কিছু কাল পর ই ইন্তেকাল করেন। তাদের মৃত্যুতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট পেতেন , তাঁর

চোখ কান্নায় ভিজে যেত , কিন্তু তার পর ও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে , এমন কথাই তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার মুখে উচ্চারণ করতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা উম্মে কুলসুম ইন্তেকালের পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কবরের পাশে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল এবং সে সময় তাঁর চোখ ছিল অশ্রু পূর্ণ।

নবীজি (স) তিন ছেলে: কাসিম, আবদুল্লাহ এবং ইব্রাহীম। এই তিনজনই শিশু কালে ইন্তেকাল করেন।

দুই বছর কয়েক মাস বয়সে কাসিম মক্কায় মারা যান। এ কারণে নবীজিকে (স) আবুল কাসিম বলেও ডাকা হতো। কাসিমের মা ছিলেন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ।

আব্দুল্লাহর জন্ম ও খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঔরসে হয় । নবীজির (স) নবুয়ত লাভের কিছু কাল পরে তিনি ও ইন্তেকাল করেন।

ইব্রাহিমের মা ছিলেন মারিয়া আল-কিবতিয়্যা । তিনি ১৭ বা ১৮ মাস বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইব্রাহিমের মৃত্যুতেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন। কেঁদেছিলেন।তখন সাহাবিরা বললেন , আপনিও আল্লাহর রাসূল'! শুনে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন , " ইবনে আওফ , এ তো করুণার কান্না"। এরপর আরেকবার হলো (অর্থাৎ প্রথম কান্নার পর আবার কাঁদলেন) ।এরপর তিনি (সা) বলেন , " চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে , অন্তর কষ্টে মুচড়ে উঠে , কিন্তু আমার রবকে সন্তুষ্ট করে এমন কথা ছাড়া আর কোনো কথা বলব না। ইব্রাহিম , তোমার চলে যাওয়াতে তো আমরা কষ্ট পেয়েছি।"

আনাস ইবনে মালিক রাযি. বলেন , "আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে সন্তানদের সাথে অধিকতর দয়ালু আর কাউকে দেখিনি ।"

নাতি-নাতনিদের সাথে নবীজি (সা) যেমন ছিলেন

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাতিদের অনেক ভালোবাসতেন । আদর করতেন।নাতীদের কোলে নিয়ে চুমু দিতেন । সালাতে দুষ্টুমি করলে সহ্য করতেন । পিঠের উপর নিয়ে খেলতেন ।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাতজন নাতিনাতনি ছিলেন। তারা হলেন

–

- **হাসান ইবনে আলী:** আলী ইবনে আবু তালিব ও ফাতিমা রাযি. প্রথম সন্তান ছিলেন হাসান রাযি.। তার সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবয়ব দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি মিল ছিল। ৩ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।
- **হুসাইন ইবনে আলী:** আলী ও ফাতিমা রাযি. দ্বিতীয় পুত্র হুসাইন ৪ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৬১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।
- **উম্মে কুলসুম বিনতে আলী :** নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। উমার ইবনে খাত্তাব তাকে বিয়ে করেন । যায়েদ ইবনে উমার ও রূকাইয়্যা নামে তাদের ২ সন্তান হয় । তিনি ও তার পুত্র যায়েদ দু'জনেই ৭৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।
- **যায়নাব বিনতে আলী :** নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন দশায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের সাথে তার বিয়ে হয় । আব্দুল্লাহর স্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কয়েক সন্তানের জন্মদেন এবং ইন্তেকাল করেন।যায়নাব ও আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের অনেক বংশ ধর এখনো বেঁচে আছেন ।
- **আবদুল্লাহ ইবনে উসমান :** তিনি রুকাইয়্যার রাযি. ছেলে ছিলেন । হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন। ছয় বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।
- **উমামা বিনতে আল-আস :** তিনি যায়নাবের মেয়ে ছিলেন। ফাতিমা রাযি. মৃত্যুর পর আলী রাযি. তাকে বিয়ে করেন । তবে তাদের ঔরসে কোনো সন্তান জন্মলাভ করেনি । আলীর মৃত্যুর পর মুগীরা ইবনে নাওফলের সাথে তার বিয়ে হয়। সেখানে ও তাদের কোনো সন্তান হয়নি ।
- **আলি ইবনে আল-আস :** তিনি উমামার সহোদর ভাই । বালেগ হওয়ার আগেই নবীজির (স) এর জীবন দশায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

হারাম পরিহার শিক্ষা দিতেন

বাল্যকাল থেকেই নাতি-নাতনিকে হালাল-হারাম সম্পর্কে অবগত করতেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, হাসান ইবনে আলী (রা.) সদকার একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিলেন। নবী (সা.) তা ফেলে দেওয়ার জন্য কাখ কাখ (ওয়াক ওয়াক) বলেন। তারপর বললেন, তুমি কি জানো না যে আমরা সদকা খাই না? (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৪০৪)

এ হলেন কোমলপ্রাণ নবী (সা.)। এ হলো শিশুদের সঙ্গে তাঁর কোমল আচরণ। তিনি বকা দেননি। কখনও প্রহার করেননি। নামাজ অবস্থায় যে শিশুটি তাঁর পিঠে চড়েছে তার ওপর গলাও উঁচু করেননি। তিনি বরং তার জন্য অপেক্ষা করেছেন। সিজদা দীর্ঘ করেছেন!

সুতরাং প্রতিটি মুমিনের জন্য দায়িত্ব হলো, জীবনের সৌন্দর্য ও সম্পদ সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হওয়া এবং তাদেরকে কল্যাণকামিতার সঙ্গে প্রতিপালন করা।

-

নাতিদের চুম্বন ও কোলে নেওয়া

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুল (সা.) হাসান-হুসাইনকে কাঁধে নিয়ে বের হলেন (দুই কাঁধে দুজন ছিল)। তিনি একবার হাসানকে চুমা দেন আরেকবার হুসাইনকে, এভাবে করতে করতে আমাদের কাছে আসেন। তখন এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-কে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি এদের খুব ভালোবাসেন? তখন তিনি বলেন, যে তাদের (হাসান-হুসাইন) ভালোবাসবে সে আমাকে ভালোবাসবে। আর যে এদের রাগান্বিত করবে সে আমাকে রাগান্বিত করবে। (মুসনাদ আহমদ, হাদিস : ৯৯২৪)

রাসুল (সা.)-এর কাঁধে আরোহণ

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসুল (সা.) এর সঙ্গে এশার নামাজ পড়ছিলাম। রাসুল (সা.) সিজদা করলে হাসান -হুসাইন লাফ দিয়ে তাঁর পিঠে উঠত। রাসুল (সা.) সিজদা থেকে ওঠার সময় তাদের হাত দিয়ে নামিয়ে

দিতেন। তিনি আবার সিজদা করলে তারাও আবার পিঠে উঠত। এভাবে তিনি নামাজ শেষ করেন। (মুসনাদ আহমদ, হাদিস : ৭৮৭৬)

আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় রাসুল (সা.) স্বীয় কন্যা জয়নবের মেয়ে উমামাহ বিনতে আবুল আসকে নিয়ে আমাদের কাছে আসেন। তখন উমামা শিশু ছিল, রাসুলুল্লাহ তাকে কাঁধে নিয়ে নামাজ আদায় করেন। তিনি রুকু করার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং দাঁড়ানোর সময় আবার কাঁধে উঠিয়ে নিতেন। এভাবে তিনি নামাজ আদায় শেষ করেন। (আবু দাউদ, হাদিস: ৯১৮)

নাতিদের জন্য দোয়া করতেন

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, দিনের এক প্রহরে আমি রাসুল (সা.) এর সঙ্গে রওনা হলাম। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেননি। আমিও তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম না। অবশেষে বনু কাইনুকা-এর বাজারে পৌঁছালেন, এরপর তিনি ফিরে চললেন এবং ফাতিমা (রা.)-এর ঘরে ঢুকলেন। বললেন, এখানে কি শিশু আছে, এখানে কি শিশু আছে, অর্থাৎ হাসান। ফাতেমা (রা.) তাঁকে দেরি করাচ্ছেন। আমরা অনুমান করলাম যে তাকে তার মা সোনা-রুপা ছাড়া পুঁতির মালা পরাচ্ছেন—যা বাচ্ছাদের পরানো হয়। কিন্তু অল্পক্ষণের ভেতরেই হাসান দৌড়ে চলে এলেন এবং রাসুল (সা.)-এর গলা জড়িয়ে ধরলেন। সে সময় রাসুল (সা.) বলেন, 'হে আল্লাহ! আমি তাকে পছন্দ করি, তুমিও তাকে পছন্দ কোরো, আর পছন্দ কোরো সেসব ব্যক্তিকে যে তাকে পছন্দ করে।'

নাতিদের সঙ্গে রাসুল (সা.)-এর সম্পর্কটা ছিল ভালোবাসার অটুট বন্ধনে আবদ্ধ। তিনি তাদের সঙ্গে খেলাধুলা করেছেন। তাদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। কোলে বসিয়েছেন। তাদের আনন্দ দিয়েছেন। নিজে আনন্দিত হয়েছেন।

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে নবীজি (সা) যেমন ছিলেন

পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক একটি সুখময় সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা.)। সৌহার্দপূর্ণ মানবিক সমাজ বিনির্মাণে তিনি অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় এবং তাদের সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের ব্যাপারে তিনি বলেন, 'আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।' (মুসলিম, হাদিস : ২৫৫৬)

তাই আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক।

আত্মীয় অমুসলিম হলেও তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাদের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে।

এগিয়ে আসতে হবে তাদের প্রয়োজন পূরণে। আসমা (রা.) বলেন, 'কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধিকালে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলেন। আমি রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমার কাছে আগ্রহ নিয়ে আমার মা এসেছেন। আমি কি মায়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমার মায়ের সঙ্গে তুমি সদ্ব্যবহার করো।' (মুসলিম, হাদিস : ১০০৩)

নবীজি নিজেও অমুসলিম আত্মীয়দের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করতেন। তাদের সম্মান করতেন। তাদের কাছে পাঠাতেন উপহার-উপঢৌকন। অমুসলিম আত্মীয়-স্বজন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেও তিনি তাদের প্রতি সদয় আচরণ করতেন। বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন করতেন।

ইসলামের সমরনীতি অনুসরণ করে সম্ভাব্য সব উপায়ে তাদের প্রতি কোমল আচরণ করতেন।

আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবা ছিলেন রাসুল (সা.)-এর দুধমাতা। শৈশবে তিনি তাঁর কাছ থেকে দুধ পান করেন। তিনি মুসলমান হননি। কিন্তু নবীজি আজীবন তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি প্রায়ই তাঁর কাছে কাপড়চোপড় ও অন্যান্য সামগ্রী উপহার হিসেবে পাঠাতেন। (আসাহহুস সিয়ার, পৃষ্ঠা : ৬)

আওতাসের যুদ্ধে মুসলমানরা নবীজির দুধমাতা হালিমা সাদিয়ার বনু সাদ গোত্রের এক লোককে সপরিবারে বন্দি করেন। পরিবারের বৃদ্ধা নারী বলেন, আমি

তোমাদের নবীর বোন। আমাকে গ্রেপ্তার করছ কেন? তা শুনে সাহাবারা তাঁকে রাসুলের কাছে নিয়ে এলেন। বৃদ্ধা স্বীয় পিঠ খুলে একটি দাগ দেখিয়ে বলেন, এই যে দেখুন, আপনি শৈশবে আমার পিঠে কামড় দিয়েছিলেন। আমি আপনার বোন। হালিমার কন্যা শায়মা। তাকে চিনতে পেরে নবীজি অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। তাঁর সম্মানে স্বীয় চাদর বিছিয়ে দিলেন। উপহার-উপঢৌকন দিয়ে তাঁকে বললেন, আপনি চাইলে আমার বাড়িতে যেতে পারেন। আমি সম্মানের সঙ্গে আপনার খেদমত করব। চাইলে নিজ বাড়িতেও ফিরে যেতে পারেন। আপনাকে পৌঁছানোর ব্যবস্থা আমি করে দেব। তিনি নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে চাইলেন। রাসুল (সা.) তাঁকে সম্মানের সঙ্গে নিজ বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। (ইবনে কাসির, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৬৮৯)

বদরের যুদ্ধে বন্দিদের মধ্যে সবাই ছিল নবীজি ও সাহাবাদের আত্মীয়-স্বজন। সেকালে তো আর কারাগার ছিল না। নবীজি বন্দিদের সাহাবাদের মাঝে বণ্টন করে দেন। তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও মেহমানদারি করার আদেশ দেন। তখন মদিনায় চরম দুর্ভিক্ষ চললেও সাহাবারা বন্দিদের সেবা-যত্নের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা ইতিহাসে বিরল। মুসআব ইবনে উমাইরের ভাই আব্দুল আজিজ বলেন, 'আমি যে সাহাবির ঘরে বন্দি ছিলাম, তারা আমাকে রুটি খেতে দিতেন এবং নিজেরা আহারাভাবে খেজুর খেতেন। আমি লজ্জিত হয়ে অনেক সময় খেজুর খাওয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তারা রুটি খেতেন না। আমাকেই রুটি খেতে বাধ্য করতেন।' (ইবনে কাসির, আস-সিরাতুন নাবাবিয়া, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৭৫)

সুবহানাল্লাহ! শত্রুর মুখে এমন স্বীকারোক্তিই প্রমাণ করে, কেমন ছিল রাসুল (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ। এমন আচরণে মুগ্ধ হয়েই মানুষ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে।

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি আত্মীয়দের প্রতি স্বজনপ্রীতি করতেন। বরং তিনি তাদের প্রতি ন্যায়সংগত আচরণই করতেন। রাসুলের চাচা আব্বাস (রা.)-এর ঘটনা থেকেই আমরা বিষয়টি আঁচ করতে পারি। বদরের যুদ্ধে আব্বাসও বন্দি হলেন। তখনো তিনি মুসলমান হননি। যখন তাঁকে বন্দি করে আনা হলো তখন নবীজির মন মমতায় আর্দ্র হয়ে উঠল। রাতে আব্বাস বাঁধনের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। তা দেখে নবীজির ঘুম হচ্ছিল না। তিনি অনেক বেশি অস্থির হয়ে ছটফট করতে

লাগলেন। বিষয়টি এক সাহাবি বুঝতে পেরে আব্বাসের বাঁধন ঢিল করে দিলেন। কিন্তু আত্মীয়তার কারণে বিশেষ কারো শাস্তি হ্রাসের বিধান ইসলামে নেই। তাই নবীজি বলেন, সবার বাঁধন ঢিল করে দাও। (সিরাতুন নবী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৩৩) সাহাবারা আব্বাসের মুক্তিপণ ক্ষমা করার আবেদন করলে রাসুল (সা.) বলেন, 'আল্লাহর কসম, তোমরা তার একটি দিরহামও ক্ষমা করবে না।' (বুখারি, হাদিস : ৩৭২৩)

নবীজির জীবনে এমন বহু ঘটনা আছে, যাতে অমুসলিম আত্মীয়দের প্রতি তাঁর মুগ্ধকরা আচরণ প্রকাশ পেয়েছে। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তারা ইসলামও গ্রহণ করেছে দলে দলে। মক্কার সেকালের কাফির সর্দার আবু সুফইয়ান ছিলেন রাসুল (সা.)-এর শ্বশুর। পরম শত্রু হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে নবীজি সদাচার করতেন। সেই সদাচারের স্বীকৃতি তাঁর বক্তৃতা থেকেই পাওয়া যায়। সপ্তম হিজরিতে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফইয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মুহাম্মদ তোমাদের কী শিক্ষা দেন? জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'তিনি আমাদের শিক্ষা দেন—তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক কোরো না। মূর্তিপূজা করতে তিনি নিষেধ করেন। নামাজ পড়া, সত্য কথা বলা, চারিত্রিক নির্মলতা অর্জন এবং আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় রাখার আদেশ দেন।' (বুখারি, হাদিস : ৬)

আত্মীয়-স্বজন অন্যায়-অবিচার করলেও তিনি তাদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও ভদ্রোচিত আচরণ করতেন। তিনি বলতেন, 'আত্মীয়দের সঙ্গে প্রতিদানমূলক সদ্ব্যবহারকারী প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষকারী নয়। বরং সে-ই প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারী, যে অন্যপক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন করলেও আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে।' (বুখারি, হাদিস: ৫৪৫২)

নবীজি (সা.) আত্মীয়তার সম্পর্ককে বেশ গুরুত্ব দিতেন। মুসলিম আত্মীয়দের প্রতি যেমন তিনি প্রসন্ন ছিলেন, অমুসলিম আত্মীয়দেরও তিনি পরম মমতায় সিক্ত করেন। তাই আসুন, আমরাও আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় করে কল্যাণময় ও সৌহার্দপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার তাওফিক দান করুন। আমিন।

অতিথিদের সাথে নবীজি (সা) যেমন ছিলেন

অতিথিপরায়ণতার আদর্শ ছিলেন প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)। অতিথিদের সামনে তিনি ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল। যেকোনো মেহমানকেই জানাতেন তিনি সাদর আমন্ত্রণ ও উষ্ণ অভ্যর্থনা। ধর্ম-বর্ণ ও শত্রু-মিত্রের ফারাক তিনি করতেন না। অতিথিদের কাছ থেকে কোনো অসৌজন্যতা প্রকাশ পেলেও ধৈর্য ধরতেন। আদর-আপ্যায়নের যেন কোনো ত্রুটি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতেন। বিদায়বেলায় মেহমানের হাতে তুলে দিতেন উপহার-উপঢৌকন। তার আন্তরিক আতিথেয়তায় অতিথিরা মুগ্ধ-বিস্মিত হতো। সেই মুগ্ধতা অনেক মেহমানকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে।

মেহমানের খাতির-যত্ন ও আদর-আপ্যায়ন

অতিথির আদর-আপ্যায়ন ও খাতির-যত্নে রাসুলের কোনো সংকোচবোধ ছিল না। তিনি মেহমানের সঙ্গে একই পাত্রে বসে খেতেন। মেহমান তৃপ্তিসহকারে খেয়ে না ওঠা পর্যন্ত তিনি উঠতেন না। বসে থাকতেন। ভালো খাবারগুলো মেহমানের দিকে এগিয়ে দিতেন। নিজের পরিবারকে অভুক্ত রেখে তিনি মেহমানদের খাওয়াতেন।

আসহাবুস সুফফা ছিলেন রাসুল (সা.)-এর নিত্য মেহমান। তিনি তাদের খাতির-যত্নের কোনো কমতি রাখেননি। অন্য মেহমানদের তিনি আসহাবুস সুফফার সঙ্গে মসজিদ-ই-নববীতে থাকার ব্যবস্থা করতেন। তা ছাড়া দুই নারী সাহাবি রামলা ও উম্মে শরিক (রা.)-এর ঘরেও মেহমানদের থাকার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

এতেও সংকুলান না হলে তিনি সাহাবাদের মধ্যে মেহমানদের বণ্টন করে দিতেন। তাদের খাতির-যত্নের তাগিদ দিতেন। সাহাবারাও তাদের সমাদর করতেন।

মক্কা বিজয়ের পর মদিনায় অতিথির কোনো অভাব ছিল না। রাসুল (সা.) নিজেই তাদের খেদমত আঞ্জাম দিতেন। আর সাহাবি বিলাল (রা.)-কে রাষ্ট্রীয় মেহমানদের বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেন।

সর্বজনীন আতিথেয়তা

রাসুল (সা.)-এর আতিথেয়তায় শর্তের কোনো বেড়াজাল ছিল না। ধনী-দরিদ্রের তফাত ছিল না। মুসলিম-অমুসলিমের তারতম্য ছিল না। শত্রু-মিত্রের কোনো ফারাক ছিল না। রাসুল (সা.) বলেন, 'যে অলিমায় শুধু ধনীদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং গরিবদের বাদ দেওয়া হয়, তা সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার। ' (বুখারি, হাদিস : ৪৭৯৯)

সাহাবি রুশদ ইবনে আবদুর রহমান বলেন, 'ইসলাম গ্রহণের আগে আমি রাসুল (সা.)-এর মেহমান হয়েছিলাম। তিনি আমার খোঁজখবর নিলেন। তার কাছে আমাকে বসালেন। যতক্ষণ আমি তার কাছে ছিলাম ততক্ষণ তার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হলাম। তার এই অসাধারণ আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট হয়ে আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। ' (হায়াতুস সাহাবা, পৃষ্ঠা : ৪৪৭)

বিদায়কালে উপহার দেওয়া

বিদায়কালে রাসুল (সা.) মেহমানদের পথখরচ ও উপহার দিতেন। কখনো পর্যাপ্ত উপহার দিতে না পারলে অল্প হলেও দিতেন এবং মেহমানের কাছে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করতেন। কখনো বিশেষ সাহাবিকে বলে দিতেন, যাতে তিনি তাদের পথখরচ দিয়ে দেন। অন্যান্য উপহার তো থাকতই। বিশেষত যখন কেউ তাঁর কাছে উপহার নিয়ে আসত তখন তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং তাকে বিদায়কালে নিজের পক্ষ থেকে অবশ্যই উপহার দিতেন। হারিস ইবনে আউফের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল রাসুলের মেহমান হলো। বিদায়কালে রাসুল (সা.) তাদের প্রত্যেককে ১০ উকিয়া পরিমাণ রুপা দিলেন। সাহাবি হারিসকে দিলেন ১২ উকিয়া পরিমাণ।

প্রিয় নবী (সা.)-এর আতিথেয়তা মুসলমানদের অনুপম আদর্শ। আধুনিক যুগেও এসব সুন্নাহই আভিজাত্যের নিদর্শন। এসব সুন্নাহ থেকে মুসলমানরা নিত্য দূরে সরে যাচ্ছে। তাই আসুন, মেহমানের সমাদর করি। তাদের খাতির-যত্ন ও আদর-আপ্যায়নে সুন্নতের অনুসরণ করি। ইসলামের সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিই পৃথিবীময়।

সাহাবিদের সাথে নবীজি (সা) যেমন ছিলেন

নবীজি (স) ছোট থেকে বড়, সবার সঙ্গে অত্যন্ত মাধুর্যপূর্ণ আচরণ করতেন। তাঁর আচরণে মুগ্ধ হয়ে চরম শত্রু পরম বন্ধুতে পরিণত হতো। তিনি সবাইকে গুরুত্ব দিতেন, কেউ কিছু বলতে চাইলে তিনি খুব গুরুত্বসহ তার কথা শুনতেন। আমর ইবনে আস (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) সমাজের নিকৃষ্ট ব্যক্তির সঙ্গেও পূর্ণ মনোযোগ ফিরিয়ে মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে কথা বলতেন।

সহযোদ্ধা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। তাঁর পরিবার থেকে শুরু করে খাদেম পর্যন্ত কেউ কখনো তাঁর কটু আচরণের শিকার হননি। হাসান ইবনে আলী (রা.) বলেন, হুসাইন ইবনে আলী (রা.) বলেছেন, আমি আমার পিতাকে রাসুল (সা.)-এর সাথীদের ব্যাপারে তাঁর আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। উত্তরে তিনি বলেন, রাসুল (সা.) ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল ও বিনম্র স্বভাবের অধিকারী। তিনি রূঢ়ভাষী বা কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন না।

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি রাসুল (সা.) অত্যন্ত সদয় ছিলেন। তাঁর নম্র আচরণে মুগ্ধ হয়েই অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। দুই জাহানের বাদশা হয়েও তিনি এতটাই সাধাসিধে জীবন যাপন করতেন যে যে কেউ খুব সহজে তাঁর কাছে যেতে পারত। তিনি সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) জিকির অত্যধিক পরিমাণে করতেন এবং অনর্থক কাজ একেবারেই করতেন না; আর নামাজ দীর্ঘ করতেন ও খুতবা সংক্ষেপ করতেন। তিনি বিধবা ও গরিবদের সঙ্গে চলা-ফেরায় সংকোচ বোধ করতেন না; যাতে তিনি তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন।

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর গৃহে প্রবেশ করতে কোনো দিন আমাকে বাধা প্রদান করেননি এবং যখনই আমাকে দেখেছেন, মুচকি হাসি দিয়েছেন।

তাঁর সঙ্গে কেউ কথা বলতে গেলে তিনি তাঁকে খুব গুরুত্ব দিতেন। পারস্পরিক আলোচনার সময় অন্যের কথা মনোযোগসহ শুনতেন। অপরজন চেহারা না ফেরানো পর্যন্ত তিনি তার দিক থেকে চেহারা ফেরাতেন না। আর কেউ তাকে

কানে কানে কিছু বলতে চাইলে, তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি মাথা সরাতেন না।

তিনি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতেন না, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতেন না, অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াতেন না এবং কৃপণ ছিলেন না। তিনি অপছন্দনীয় কথা হতে বিরত থাকতেন। তিনি কাউকে নিরাশ করতেন না, আবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতিও দিতেন না। তিনটি বিষয় থেকে তিনি দূরে থাকতেন—ঝগড়া-বিবাদ ও অহংকার করা এবং অযথা কথা বলা। তিনটি কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখতেন—কারো নিন্দা করতেন না, কাউকে অপবাদ দিতেন না এবং কারো দোষ-ত্রুটি তালাশ করতেন না। যে কথায় সওয়াব হয়, শুধু তা-ই বলতেন। তিনি যখন কথা বলতেন তখন উপস্থিত শ্রোতাদের মনোযোগ এমনভাবে আকর্ষণ করতেন যেন তাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। তিনি কথা বলা শেষ করলে অন্যরা তাঁকে প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞেস করতে পারত। তাঁর কথায় কেউ বাদানুবাদ করত না। কেউ কোনো কথা বলা শুরু করলে তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি চুপ থাকতেন। কেউ কোনো কথায় হাসলে বা বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনিও হাসতেন কিংবা বিস্ময় প্রকাশ করতেন। অপরিচিত ব্যক্তির দৃঢ় আচরণ কিংবা কঠোর উক্তি ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করতেন। কখনো কখনো সাহাবিরা অপরিচিত লোক নিয়ে আসতেন। রাসুল (সা.) বলতেন, কারো কোনো প্রয়োজন দেখলে তা সমাধা করতে তোমরা সাহায্য করবে। কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি চুপ করে থাকতেন। কেউ কথা বলতে থাকলে তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজে কথা শুরু করতেন না। অবশ্য কেউ অযথা কথা বলতে থাকলে তাকে নিষেধ করে দিতেন, অথবা মজলিস হতে উঠে যেতেন, যাতে বক্তার কথা বন্ধ হয়ে যায়।

উপসংহার

রাসুল (সা.) ছিলেন মানবসভ্যতার আদর্শ। নববি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মানবীয় গুণাবলিতে তিনি ছিলেন সবার অনুকরণীয়। সাধারণ মানুষের মতোই ছিল তাঁর জীবনযাত্রা। স্ত্রী, সন্তান ও নাতিদের নিয়ে ছিল তাঁর পরিবার।

তাই উম্মতের রাসুল হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন আদর্শ স্বামী, বাবা, নানা ও পরিবারে সচেতন সদস্য। নানার ভূমিকা পালন করে নাতি-নাতনিদের সঙ্গেও সময় কাটিয়েছেন। তাদের আনন্দে তিনি আনন্দিত হয়েছেন।

সন্তানের প্রতি স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসা মানুষের সহজাত। ভালোবাসার শক্ত এ ভিতের ওপরই টিকে আছে মানবজাতি, দাঁড়িয়ে আছে মানবসভ্যতা। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার প্রগাঢ় ভালোবাসার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘জেনে রেখো! নিশ্চয় সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (এর মোহ ও মমতা) তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা।’ সূরা আনফাল : ২৮

নবী (সা.) এর সিরাত বা জীবনচরিত পুরোটাই আলোকিত। নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)ও ছিলেন তার সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। এবং তাদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এ প্রসঙ্গে হজরত আনাস (রা.) বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তুলনায় পরিবার-পরিজনের প্রতি অধিক স্নেহ-মমতা পোষণকারী আর কাউকে দেখিনি।’ -আল আদাবুল মুফরাদ : ৩৭৬।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় থেকে শুরু করে সবার সাথে ভালো ব্যবহার করে সবার মন জয় করে নিয়েছিলেন ।তাঁর বিনয় ও উদারতার জন্য বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন । আমাদের উচিত , তাঁর সুন্নাত নিজেদের জীবনে ধারণ করা এবং একটা সুন্দর পরিবার,সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা।